ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 01-07
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.172

সোমেন চন্দের নির্বাচিত গল্পে সাম্যবাদী ভাবধারার কথাবিশ্বে মানবজীবনের রেখাচিত্র

ড. সম্প্রিয়া চ্যাটার্জী, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গলসী মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 04.09.2025; Accepted: 11.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The First World War, the middle time of First and Second World War, were captured in Somen Chanda's writings. Somen was a famous writer of the 40's decade. The depth of the content in his writings has been multidisciplinary. He created the character, dialogue, plot, topic in accordance with his time. He died in unknown killer's knife. He was the leader of the Trade Union. He received membership of the Communist Party. He was the writer like Sukanta Bhattacharya. The ideals of communism are reflected in his writings. The three stories 'Pratyabartan', 'Banaspati' and 'Sanket' written by him. In these three stories Somen wants to spread the ideals of communism into the public; that has been reflectected. In the story 'Pratyabartan', Prashanta's life associated with the struggle for Homeland can see the ruins of the past. In the story 'Banspati', the dewing myth surrounded a tree. The events of different times have been transformed there. In the story 'Sanket', the owners arrange for more profit in less money without solving the problem of these three stories have been captured by the flow of equality. Ordinary people are tried about the bitter experience. Somen dreamed of establishing equality in the midist of that difference. Those verses are the ones who have taken place in the narrative discussion.

Keywords: Equality, Governance, Exploitation, Protest

সোমেন চন্দ বাংলা কথাসাহিত্যের বিশিষ্ট একটি নাম। ৪০ এর দশকে বাংলায় যে খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের আবির্ভাব হয়েছিল; তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেখক ছিলেন তিনি। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক বিপক্ষের হাতে অসময়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন তিনি। কলকাতা এবং গ্রামসমাজ সন্নিহিত মফস্বলের দাঙ্গা, দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক সমস্যা, আপামর জনসাধারণের সমস্যাবলী উল্লিখিত হয়েছে তার লেখায়। সমাজ ব্যতীত সাহিত্য সতত অসম্পূর্ণ। সেই সামাজিক বাস্তব সতত উঠে এসেছে সোমেনের লেখায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে যে সামাজিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল; সেই অচলাবস্থাই সোমেন চন্দের মতো লেখককুলকে নির্মাণ করতে সহায়তা করেছিল। বাস্তবধর্মী প্রগতিশীল মানসিকতায় সমৃদ্ধ ছিল লেখকের মনন-মানসিকতা। যৌবনের অফুরান দীপ্তি তার সাহিত্যের মধ্যে নতুন প্রাণ পেয়েছে। সামাজিক বৈষম্যের প্রতিবাদ চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাহিত্য সমাজের বাস্তবধর্মী প্রতিফলন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটার আগে পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভীষণ আঘাত পৃথিবীকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল। বামপন্থার আদর্শ সমগ্র বিশ্বে সেসময় যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল; সেই আদর্শই সোমেনের কাছে হয়ে উঠেছিল আশ্রয়স্থল। প্রাকলগ্নে সময়, সমাজ যেভাবে পীড়িত হয়ে পড়েছিল; তার বয়ান এভাবেই ফুটে উঠেছে সে সময়ের সাহিত্যে। শ্রমিকের শ্রমের যথোচিত মূল্য না পাওয়া; সমাজব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবান্বিত সময় সাধারণ মানুষের সত্তাকে করে তুলেছিল বিপর্যস্ত।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সমালোচকের মূল্যবান মন্তব্য -

> "এবং যে পথে সে অগ্রসর হচ্ছিল, সেটা তার স্বনির্বাচিত-সাম্যবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথ।"[১]

বিশ্বযুদ্ধের আবহ গম্ভীর করে তোলে মানুষের দিনানুদৈনিক জীবন। তার প্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন অদ্ভুতভাবে প্রভাবিত হয়। তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ তাঁর লেখায় সমকালীন এসব বিষয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন। শোষিত, নিপীড়িত জনগণের মানসিকতা ধরা পড়েছে এ সময়ের সাহিত্যে। নির্বাচিত কয়েকটি প্রসঙ্গ অনুযায়ী কিছু গল্পে সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামের আখ্যান তুলে ধরেছেন লেখক।

'প্রত্যাবর্তন' গল্পের শুরুতেই বলে দেওয়া হয় যে, ঘটনাটি সুদীর্ঘ ২৫ বছর পরের। সাধুভাষায় লেখা গল্পের মধ্যে লেখক এক মায়াবী সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন। বিকেলের পড়ন্ত রোদে হাঁটতে হাঁটতে গ্রামে এসে দাঁড়ায় প্রশান্ত। বুনোফুল, ঘাস ইত্যাদির জঙ্গলে আর নদীকূলের মাঝিকে দেখে সে ২৫ বছর পূর্ববর্তী গ্রামের কথা স্মরণ করে। মুহূর্তের পর মুহূর্ত ধরে এই সময়ের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলে। পাটের ক্ষেতে পাটচাষিদের দেখে প্রশান্তর মনে তার বাড়ির চিত্রই সবার আগে উদিত হয়।

স্মরণ করা যায় কবির বিখ্যাত উক্তি -

> "ভাঙাচোরা বুড়ি গলা
> বিশুদ্ধ অতলস্পর্শ,
> ঘরে ফিরতে বলে ডাকে।"[২]

তার মনে হয়- সম্পূর্ণ ভারতের মানচিত্রে তার প্রকৃত বাসস্থানটি কোথায়? দীর্ঘ ২৫ বছরের অজ্ঞাতবাসের ফলে বাড়ির স্মৃতি তার কাছে ম্লান হয়ে পড়েছে। তবু আজন্মের বন্ধন এই জন্মভূমি। বাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে অন্য মানুষের কৌতূহলের শিকার না হয়ে তার মনে হতে থাকে যে, মানুষের মানসিকতা কি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে? সন্ধ্যার অন্ধকারে কালু মিঞার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। কালু মিঞা তার বাল্যবন্ধু। সরল বাক্যালাপে তাদের আলাপচারিতা জমে ওঠে।

লেখক গ্রামের মানুষের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে-

> "এ গাঁয়ের নবীন বা প্রাচীন আর কেউ এই পথে আসিয়া পড়িলে তাহাকে দেখিয়েও দেখিবে না, অথবা চাহিলেও একটা বিশেষ করুণার দৃষ্টিতে তাকাইবে ইহা সে চায় না। বিশেষত তাহারা যখন দেখিবে এক ঝাঁক কঙ্কালসার মানুষের মধ্যে একটি মেদ-বহুল মাংসল পুরুষ।"[৩]

গ্রামের এমন অবস্থার কারণ তথা ফলাফল গল্পের মধ্যে স্পষ্ট। অভাব, অন্নহীনতা, দুর্ভিক্ষ, অনাহার, মৃত্যু মানুষকে পীড়িত করেছে অহরহ। প্রশান্ত কালু মিঞার সঙ্গে তার ঘরে আসে। কেরোসিন তেলের কুপিতে কালুর ঘরদুয়ার-এর অবস্থা দেখে আতঙ্কিত হয় প্রশান্ত। কালুর বিশ্বাস, সবই ভাগ্যের খেলা। সে তার ছোটো ছেলে আলিকে ডেকে আনে। জন্মান্ধ ছেলেটির অবস্থা দেখে মায়া হয় প্রশান্ত - র। কালুর বড়ো দুই ছেলে আলাদা গ্রামে উচ্চবিত্তবিশিষ্ট বাড়িতে কর্মরত। সংসারের জোয়াল টানার কাজটি অবিরতভাবে করে যেতে হয় কালুকে। ভাগ্য বা নিয়তির ওপর নির্ভরশীল কালুর প্রথাগত ভাবনাকে ভাঙতে পারে না প্রশান্ত। মুড়ি, চিঁড়ে, গুড় দু'টি পাকা আম দিয়ে বন্ধুকে আহারাদি সেরে নিতে দেয় কালু মিঞা। কুয়ো থেকে জল তুলে এনে পান করার বিষয়টি নিয়ে কালু সচেতন হলেও জাতপাতের বৈষম্যে বিশ্বাসী নয় প্রশান্ত।

তার উক্তি লক্ষণীয়-

> "না না, ওসব না, তুমিই এনে দাও, আমার জাত মারা যাবে না, আমাদের কোন জাত নেই।"[৪]

প্রশান্ত পরিবর্তিত হয়নি। যুক্তিবাদী, সংস্কারমুক্ত মনই তার সঙ্গী। কালু তার ভাগ্যের বাইরে অন্য কিছু চিন্তা করতে পারে না। কালুর কথার মধ্যে স্বদেশি আন্দোলনের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। মাটিতে খড়ের বিছানায় নতুন একটি কাঁথাতে শুয়ে শুয়ে সেইসব দিনের স্মৃতিকণিকায় ডুব দেয় প্রশান্ত। ফেলে যাওয়া বাড়িতে মা-বাবা না থাকলেও পিসি, পিসির ছেলেমেয়ে, ঠাকুমা-বাকি পরিজনেরা কোথায়- তা জানতে চায় প্রশান্ত। পিসিমারা ঠাকুমাকে একা রেখে চলে যান বহুদিন আগে। বুড়ি রান্না করে অনেকদিন খেয়েছে বহু কষ্টে। তারপর একদিন রান্না করা কোনো খাদ্যদ্রব্য নামাতে গিয়ে পা পুড়িয়ে ফেলেছে। সেই ক্ষতস্থান বিষাক্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে বুড়ির। নিজের ঠাকুমার মৃত্যুর এমন করুণ বিবরণ শুনে হতাশ হয় প্রশান্ত। জীবনের ছোঁয়া আর মৃত্যুর পরশ এত নিকটাত্মীয় যে, সেখানে তৃতীয়

কোনো বিষয়ের অন্তর্ভুক্তির স্থান নেই। আর এই মৃত্যু বড়োই ভয়াবহ। কালু এ সময় দক্ষিণের আকাশে প্রচণ্ড ঝড়ের আগমন দেখতে পায়। ঝড়ের আরব্ধবার্তায় তাই আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। কালুর ঘরে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে প্রশান্ত। সকালে প্রশান্ত-র ঘুম ভাঙলে কালু অতিথি আপ্যায়নের জন্য নদীতে মাছ ধরতে যায়। প্রশান্ত তার ফেলে আসা জন্মভূমির ভিটেমাটিতে সন্ধান করে ফেরে তার পূর্বেতিহাসের স্মৃতি। পরিত্যক্ত ভিটেতে সেই সন্ধান উজ্জ্বল হয়ে থাকে স্মৃতিপটে।

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' থেকে কিছু উক্তি উল্লেখ করা যায়-

> "ওই তাহাদের বাড়ী-ঘর, ওই বাঁশবন, ওই সল্‌তে খাগীর আমবাগানটা, নদীর ধার, দিদির সঙ্গে চড়ুইভাতি করার ওই জায়গাটা-ও সব সে কত ভালবাসে!"[৫]

অপুর মতো প্রশান্তও তার অতীতকে ফিরে পেতে চায় ব্যাকুল আগ্রহে। যুক্তিবাদী মননশীলতা মানুষকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে।

পরবর্তী গল্প 'বনস্পতি'-তে লেখক অতীতের স্মৃতি রোমন্থনের কথকতা আবহমান করে তুলেছেন। একটি বটগাছকে কেন্দ্র করে একটি অঞ্চলের ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে। হাট ছাড়া পীরপুর গ্রামে কোনো বসতি নেই। দৈত্যাকার একটি সুবিশাল বটবৃক্ষ গ্রামের সম্মুখে প্রহরীর মতোই দাঁড়িয়ে আছে। পার্শ্ববর্তী বেশ কিছু গ্রাম থেকে পীরপুরের হাট দেখা যায়। বটগাছের পাতায় নদী, বিলের জলীয় বাষ্পে দোলা লাগে। সেই গাছের পাতা কুড়িয়ে নিয়ে যায় কোনো এক মুসলমান বুড়ি। কিংবদন্তীমিশ্রিত, নদীসমৃদ্ধ এক অঞ্চলের ইতিকথাকে লেখক যেন একটি ছবির দ্বারা পাঠককে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে পীরপুর গ্রামের বৃদ্ধ জমিদার নবকিশোর চৌধুরীর জীবন সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন লেখক। বৃদ্ধ জমিদারের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী অরুন্ধতীর সঙ্গে প্রেমালাপে মগ্ন হয়ে পড়েছে তাঁর একমাত্র ছেলে সুরেন্দ্রকিশোর। এই অভাবনীয় অপরাধ ক্ষমার্হ নয়। বাগানের কোনো একটি নির্জন কক্ষ জমিদারের ব্যভিচারী ক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত হতো। সেখানে অরুন্ধতীকে বন্দিনী করে রাখা হয়। এরপর থেকে তাদের দু'জনেরই কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এর কয়েকদিন পর নদীর ধারে বট আর অশ্বত্থের চারা রোপণ করে বিধিসম্মত উপায়ে উপাসনা শুরু হয়। সেই উপাসনার সঙ্গে সেখানে ছাগবলি দেওয়া হয়। বটগাছের জন্মের ইতিকথা এরকম। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত পরাধীন হল। পীরপুরের একটি ছেলে অর্জুন সিরাজের পক্ষে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছিল। গ্রামের মধ্যে একটি দুর্ধর্ষ বাঘের আতঙ্কে সবাই যখন আতঙ্কিত; সে সময় অর্জুন সেই বাঘটিকে ঘায়েল করে। তার প্রেমের কথকতা ধরা পড়ে গল্পের মধ্যে। তার বীরত্ব তথা সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে চম্পক তার প্রেমে পড়ে। অর্জুন যখন নৌকায় করে দূরদেশে যাত্রা করে; তখন চম্পক সেই গাছের কাছে প্রার্থনা জানায়। প্রকৃত অর্থে অর্জুন স্বদেশের রক্ষাকর্তা, দেশপ্রেমিক। তার সময়কাল পৃথক। সে কিন্তু আর ফিরে আসে না।

এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন-

> "পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে স্বাধীনতার লড়াই করিয়া সে প্রাণ দিয়েছে।"[৬]

গল্পের মধ্যে এরপর এসেছে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রসঙ্গ। বাংলায় দুর্ভিক্ষ এত ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল যে, বহু মানুষ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। রাজস্ব আদায়ের অমানবিক মানসিকতা সাধারণ জনমানসকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। দেবাংশী সেই বটগাছের তলায় নতমস্তক হয়ে সেই সময় এই বিপর্যস্ত মানুষদের অনেকেই প্রার্থনা জানিয়েছিল।

১০০ বছরের কাছাকাছি সময়ের পর পীরপুর গ্রাম যখন সমগ্র বাংলার সঙ্গে স্বাভাবিক জীবনে ফিরছে; সে সময় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হল। পীরপুরের বটগাছে একজন সিপাহি আশ্রয় নিয়েছিল। কয়েক বছর পর বসন্তের প্রকোপে গ্রামে মড়ক দেখা দিল। সেসময়ও মানুষ বটগাছের কাছে প্রার্থনা করেছিল। বহু ছাগবলি সেসময় বৃক্ষদেবতার উদ্দেশে প্রেরিত হয়েছিল। মানুষের সাধারণ লোকবিশ্বাসের মধ্যে বেঁচে থাকে বৃক্ষের মাহাত্ম্য। শঙ্কর ভুঁইমালী হঠাৎ জ্বরাক্রান্ত হয়ে মারা গেলে তার স্ত্রী বটগাছের কাছে এসে মাথা ঠুকে কাঁদতে থাকে। গল্পের মধ্যে এক বৃহৎ সময়ের ইতিহাসকে নানান ঘটনার সম্ভারে উপস্থাপিত করেছেন লেখক। শেষে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গ এসেছে। গ্রামের জামাই নৌকা করে শ্বশুরবাড়িতে এসেছেন। তাঁর হাতের পত্রিকা থেকে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জানা যাচ্ছে। সেই গল্প পড়ছে কিশোর সতু।

পীরপুর গ্রামের মনোহর চক্রবর্তী প্রচার করেন-

> "তাহাদেরই পীরপুর গায়ের রাজেন মিত্তিরের ছেলে সতীন মিত্র শহরের কোন এক সাহেবকে মারিতে গিয়া নাকি ধরা পড়িয়াছেশম্বয়ের।"[৭]

তৎকালীন সময়ের মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহসিকতা নিয়ে টিকেছিল। পীরপুরের বিশাল বটগাছ সেই ঘটনার সাক্ষী। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজির আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কিছু যুবক পীরপুর গ্রামে এসেছিল। তারা প্রচার করেছিল স্বদেশি মন্ত্র। স্বদেশি গান পীরপুরের মানুষদের মধ্যে আশার আলো জ্বালিয়ে তুলেছিল। ন্যুব্জ, বৃদ্ধ বটগাছ ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের সময় ভগ্নপ্রায়। তার মৃত্যুর সময় সমাগত। বটগাছের গুঁড়িতে একজন লুকিয়ে থাকতে পারবে এমন স্থান হয়ে উঠেছে।

লেখক এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "সেদিন হাটবার, সেদিনের অবস্থা দেখিলে এতকালের ইতিহাসকে ভুলেও মনে করা যায় না, দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়, একটা ভীষণ কোলাহল চাঁদোয়ার মতো সেই প্রকাণ্ড বটগাছের নীচে গুম-গুম করিতে থাকে।"[৮]

হাটবারের দিনই ঘটনাটি ঘটে। কর্মব্যস্ত, কোলাহলমুখর বটগাছের তলায় হাট বসেছে। হাটের মধ্যে ছেলে, বুড়ো সকলেই নিজের মতো করে সওদা করছে। একটার সময় সতীন মিত্র; যার উল্লেখ গল্পের মধ্যে পূর্বেও আছে- বক্তৃতা শুরু করেন। পীরপুর এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের কৃষকরা কিছুদিন আগে কারামুক্ত সতীনের ভক্ত হয়ে পড়েছিল। সতীন মানবাধিকার নিয়ে, মানুষের খাদ্যের অধিকার নিয়ে কথা বলছিল। মূল্যবৃদ্ধির জগতে ফসলের দাম বাড়েনি কেন-তার যথাযথ ব্যাখ্যা চেয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিল। সেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই ছিল। তাদের মনে প্রশ্নের জোয়ার আসার আগেই সতীনের কণ্ঠ রোধ করা হল। লাঠিয়াল বাহিনি এসে সতীনকে নির্বিচারে পিটিয়ে হত্যা করলো। বটগাছের মাটি ছাগরক্তের সঙ্গে মানুষের রক্তে রক্তিম হয়ে গেল। যারা বটগাছের তলায় পড়ে থাকল; তাদের পরিচর্যার জন্য কেউ সেখানে থাকলো না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সমালোচকের মূল্যবান মন্তব্য-

> "বাংলা তথা ভারতের দারিদর্য্য ও অন্নাভাবের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হল দুর্ভিক্ষ।"[৯]

এর দিন কয়েকের মধ্যেই এক ভীষণ ঝড়ে মৃতপ্রায় বটগাছ ভেঙে পড়ে। স্থানীয় জমিদার তার কাঠ বেচে অর্থ লাভ করেন। একটি বটবৃক্ষের সুদীর্ঘ ২০০ বছরের ইতিবৃত্ত লেখক বর্ণনা করেন। মানুষের সরব অভিব্যক্তির সঙ্গে বটগাছের অভিব্যক্তি যেন নীরবে ঘোষিত হয়েছে এ গল্পে। লেখক বাস্তব আর লোকবিশ্বাসকে সমান্তরাল পদ্ধতিতে বিচার করেছেন এ গল্পে। নতুন যুগে, নতুন সময়ে এ মাটিতে নতুন কোনো সমাজ, জনমানস গড়ে উঠবে। কিন্তু তার পশ্চাতে থেকে যাবে এই সময়ের ইতিহাস।

আলোচনার অন্তর্ভুক্ত পরবর্তী গল্পটি হল 'সংকেত'। এ গল্পের শুরুতেই নদীর বুকে লঞ্চ আসার ছবি আছে। পাখিদের কলরবের মধ্যে বনগ্রামের মজে যাওয়া নদীর বুকে লঞ্চ এসে দাঁড়ায়। ছেলেকে নিয়ে নদীর কূলে ছিল অন্ধ দশরথ। তামাক খাবার জন্য যখন বাবা-ছেলে দু'জনেই প্রস্তুত হচ্ছে; সে সময় লঞ্চটি এসে কূলে দাঁড়ায়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের কল্যাণে দশরথ শব্দ শুনতে পায় আর রাম তা দেখতে পায় কিছু পরেই। দশরথ বহুদিন আগে তার প্রথম স্টিমার দর্শনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়িছে ছেলের কাছে। রাম সেই বর্ণনা সমস্ত গ্রামের কাছে ব্যক্ত করেছে। বর্তমানে লঞ্চ থেকে অবতরণ করেছেন একজন বাবু। গ্রামের ইয়াসিন তাকে সেলাম করে। সেই ব্যক্তি কোনো এক কাপড় কলের ম্যানেজার। মিলের কর্মচারী সংগ্রহের জন্য এখানে তিনি এসেছেন। ইয়াসিনের সঙ্গে বলরামের বার্তালাপাইয়া ইয়াসিন তার ছোটোবেলায় ঘটা এরকম এক ঘটনার বিবরণ দেয়।

আকবর আলি এ সময় আসে এবং জানায়-

> "লড়াইয়ের খবর রাখনি, ইয়াসিন মিয়া? হেইর লাইগা ফাঁকি দিয়া লোক লিবার আইছে, জান?"[১০]

আকবর আলির মতে, যুদ্ধে যাওয়ার জন্য লোক সংগ্রহ করতে এসেছেন এই বাবু। গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হচ্ছিল এই প্রসঙ্গে। এসময় সেখানে উপস্থিত হয় বাচ্চা মৌলবী।

তার সম্পর্কে লেখক বলেছেন-

> "সে পাশের গ্রামেই থাকে এবং মাঝে মাঝে কোন পত্রিকা হাতে করিয়া আসিয়া বেলা দুইটা-আড়াইটা অবধি এ অঞ্চলের সকলকে যুদ্ধের খবর শুনাইয়া যায়।"[১১]

বাবুটির দীর্ঘ পরিচিতি সম্পর্কে বলার পর মৌলবী জানায় যে, কাপড় তৈরির জন্যই কর্মী সংগ্রহ করতে তিনি এসেছেন। রহমানকে সে জানায় যে, তার ঘরে তাঁত আছে বলে তাকেই আগে নেওয়া হবে। ইয়াসিন এবার উপস্থিত জনতার কাছে জানতে চায় যে, তার কথা জনতা বিশ্বাস করেছে কি না? বলরাম আগে তার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করলেও এখন ইয়াসিনের সঙ্গে পরামর্শ করে। ম্যানেজার গ্রামের মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন গাছের ছায়ায় বসে। তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য তাদের তিনি রাজি করান। কাপড়ের যে কলে তারা চাকরি করতে যাচ্ছে সেখানে হাসপাতাল, খেলার মাঠ, সিনেমা অর্থাৎ আধুনিক জীবনযাপনের সব রসদই মজুত আছে।

এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখ্য-

> "যৌবনের সহজ উন্মাদনায় প্রচলিত বন্ধন-সীমা ভেঙে ব্যক্তির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার উত্তেজনাই তখন তরুণ লেখকের মধ্যে প্রবল।"[১২]

নববিবাহিত রহমান তার স্ত্রী এবং বৃদ্ধ পিতাকে ছেড়ে মনোকষ্ট নিয়েই দূরে যায়। বাড়ি থেকে নদীর দিকে যাবার পথে গোলাম আলীর বাড়ির বকুল ফুলের গন্ধ মোহিত করে রহমান আর তার বাবাকে।

উল্লেখ করা যায় কবির বিখ্যাত উক্তি-

> "'যেতে আমি দিব না তোমায়'।
> তবুও সময় হল শেষ, তবু হায় যেতে দিতে হল।"[১৩]

বাবা-ছেলের অকৃত্রিম স্নেহের সম্পর্ক প্রতিফলিত হয় গল্পে। প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের আবাল্যপরিচিত ভূমি ছেড়ে নতুন অজানার সন্ধানে যাওয়া বড়ো কষ্টের। ঘুমের মধ্যে রহমান বাড়ির স্বপ্নই দেখে। অবশেষে অনেকটা সময় প্রতীক্ষার পর লঞ্চ নির্দিষ্ট স্থানের নিকটবর্তী হয়। লঞ্চ একেবারে পাড়ে আসার আগে কিছু সম্মিলিত কণ্ঠের চিৎকারে সবাই শঙ্কিত হয়ে ওঠে। দেখা যায় একদল মানুষকে। ম্যানেজারের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে ওঠে। লঞ্চ পাড়ে আসার আগে সেই মানুষের দল ঘিরে ফেলে লঞ্চটিকে। নদীর জলও যেন তাদের পদচারণার সঙ্গে উত্তাল হয়ে ওঠে।

ভিড়ের একদম সম্মুখবর্তী একটি অল্পবয়সী লোক; যে এই দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে। যে দৃঢ় কণ্ঠে জানায় যে, এখানে যেসব কথা বলে শ্রমিকদের চাকরি দিতে আনা হয়েছে; তা প্রকৃত সত্য নয়। এর মধ্যে আছে বঞ্চনা ও অবদমনের সুগভীর ইতিহাস।

তার বক্তব্যের অংশবিশেষ উল্লেখ্য-

> "আমরা স্ট্রাইক করেছি, মিলের কাজ বন্ধ। আমরা তার প্রতিবাদ জানিয়েছি।"[১৪]

অন্যায়ের এই স্রোতোধারা একবার শুরু হলে তাকে শেষ করার জন্য উদগ্র কুঠারাঘাত প্রয়োজন। অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তাদের জায়গায় চাকরিতে নিযুক্ত হতে চলেছে কিছু সরল সাধারণ মানুষ। পুঁজিবাদের তীব্র কুফল মানবসমাজকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে। সেই পাক খোলার জন্যই এই ভুক্তভোগী শ্রমিকদের চিৎকার ও প্রতিবাদ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সমালোচকের মূল্যবান মন্তব্য-

> "মার্কসের পার্টি-চিন্তার মূল কথা হলো- শ্রমিকশ্রেণির আত্মনির্ভরতা, সৃজনধর্মী শ্রেণিচেতন এবং পুরোপুরি গণতান্ত্রিক সংগঠন।"[১৫]

পাড়ে নামার পর রহমানের সঙ্গে আলাপ হয় এক অপরিচিত কিশোরের। উপায়ন্তরবিহীন এই অসহায় শ্রমিকদের পরিবর্তে তাদের কাজ দিয়ে ভবিষ্যতে তাদের বিরুদ্ধে একই ধরনের অন্যায় কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করতে পারে। গ্রামের বাদশা মিঞা ও আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে রহমান কর্তব্যকর্ম ঠিক করতে পারে না। দুপুরে বউয়ের বেঁধে দেওয়া মুড়ি, চিঁড়ে, গুড় দিয়ে খাওয়া সেরে নেয় সে। বিকেলের দিকে মৌলবীর ডাকে অনেকে এসে মিলের প্রধান দরজায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে শুয়ে পড়ে।

প্রধান দরজার একদম সামনে যাবার পর রহমান অবাক হয়ে দেখে যে, মৌলবী প্রধান দরজার সামনে শুয়ে থাকা মানুষদের গা মাড়িয়ে ভেতরে ঢোকে। যে কিশোর রহমানের সঙ্গে আলাপ করেছিল ইতিপূর্বে; সে ইতিমধ্যে সেখানে উপস্থিত হয়ে চিৎকার করছিল এই চরম অন্যায়ের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে রহমান সেই সকালের বক্তৃতা

উপস্থাপন করার লোকটিকে একটি ঢিপির ওপর দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিতে দেখে। প্রাক সন্ধ্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর বুকে তমসা ঘনিয়ে আসার আগে গুলির শব্দ শুনতে পায় রহমান। সেই ভয়াবহ দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। প্রসঙ্গক্রমে তার কিছু অংশ উল্লেখ করা যায়-

> "...কেহ রক্তাক্ত দেহে মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছে, কেহ পড়িতে পড়িতে হাঁটিতেছে; আবার হঠাৎ বসিয়া পড়িল। শীতের দিনের গৈরিক ধূলি রক্তবর্ণ হইয়া গেল।"[১৬]

রহমান প্রাণপণে দৌড়ে সেই রক্তবর্ণ ধূলিপূর্ণ স্থান থেকে দূরে চলে এসে একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে এই ভয়ানক ঘটনার পারম্পর্য।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় কবির বিখ্যাত উক্তি-

> "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
> তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।"[১৭]

রহমান এ যুগের অনিশ্চিত মানসিকতার মূর্তিমান প্রতীক। সে চেষ্টা করলেও এই হৃদয়হীন পুঁজিবাদের বিরোধিতায় সফল হতে পারবে না।। আবার চোখের সামনে মানুষকে গৃহহীন, নিরন্ন অবস্থায় সে দেখতে চায় না। সমস্যার সমারোহে দ্বান্দ্বিক বিষয় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে রহমানের মতো মানুষদের চারপাশে। শ্রমিকের শ্রমের মূল্য স্বল্প। বিবেক, আবেগ বিসর্জন দিয়ে মানুষ মানবতা ত্যাগ করতে পারে আপন স্বার্থে। সাম্যবাদিতার চিন্তা করেছিলেন সোমেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সমালোচকের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য-

> "প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯) এবং বলশেভিক বিপ্লব (১৯১৭) বাঙালি বুদ্ধিজীবীর চিন্তাজগতে আলোড়ন তুলেছিল। অপজাত, অবজ্ঞাত মানুষদের স্থান দেওয়ার পিছনে কাজ করেছিল মনোজগতের এই অভিঘাত।"[১৮]

আলোচিত তিনটি গল্পের মধ্যে প্রতীকায়িত হয়েছে নানাবিধ উপায়ে। 'প্রত্যাবর্তন' সাম্যবাদের সূর্য আনতে চাওয়া এক বিপ্লবীর কাহিনি। সে নিজে গল্পের শেষ অবধি তার সমাপ্ত হয়ে যাওয়া পরিবারের ধ্বংসস্তূপে জীবনের স্পন্দন খুঁজে বেড়ায়। 'বনস্পতি' গল্পে দেবাংশী বটবৃক্ষের নানাবিধ ইতিহাসের সাক্ষী হওয়ার সঙ্গেই তৈরি হয় সতীন মিত্রের হত্যাকাহিনি। বলি আর হত্যার রঙে রাঙা হয়ে ওঠে পীরপুরের মাটি। সাম্যবাদের আখ্যানপটে রচিত হয় এক বিপ্লবীর সৌধ। 'সংকেত' গল্পে সাম্যবাদের বিপক্ষে বৈষম্য এনেই বিভেদমূলক নীতি দ্বারা মানুষকে গৃহহীন, কর্মহীন, নিরন্ন করে তুলতে চেয়েছে পুঁজিবাদী সমাজ। সেই পুঁজিবাদ মানুষের হৃদয়ে বিবেকের প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছে। লেখক সোমেন চন্দ সাম্যবাদের আদর্শে জীবনের পথ ও পন্থা পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শোষণমুক্ত সমাজ প্রহেলিকা মাত্র। সেই চেতনাকে সম্মুখে রেখেই রচিত হয়েছে সাম্যবাদের ধারা আনার প্রচেষ্টা। তরুণ লেখক তার আত্মত্যাগের মাধ্যমে সেই সাম্যবাদিতার দিন আনতে চেয়েছিলেন। গল্পগুলিতে তার মহৎ ইচ্ছার সদর্থক প্রতিফলন সুস্পষ্ট।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, বিমলাপ্রসাদ। পরিচয় পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত প্রবন্ধ, (সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ)-এর অন্তর্গত। মজুমদার, দিলীপ, সম্পাদনা। নবজাতক প্রকাশন। কলকাতা। সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩, পৃ. ৩০৮।
২. মিত্র, অরুণ। জনমদুখিনীর ঘর। https://www.facebook.com/share/P/1FswyKCDup/ (বিবস্বান- একটি সাহিত্য গোষ্ঠী)-র Facebook Page - এ ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪-তে প্রকাশিত), প্রবেশের তারিখ: ২৪ আগস্ট, ২০২৫।
৩. চন্দ, সোমেন। প্রত্যাবর্তন। সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ। নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৩, কলিকাতা, পৃ. ৭২।
৪. তদেব, পৃ. ৭৩।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। পথের পাঁচালী। কামিনী প্রকাশালয়, ২০১১, কলকাতা, পৃ. ১৪৩।
৬. চন্দ, সোমেন। বনস্পতি। সোমেন চন্দ ও তার রচনাসংগ্রহ। নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৩, কলকাতা, পৃ. ১০৭।
৭. তদেব, পৃ. ১১৩।

৮. তদেব, পৃ. ১১৫।
৯. শ, রামেশ্বর। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ। পুস্তক বিপণি, ২০০৬, কোলকাতা, পৃ. ৬১।
১০. চন্দ, সোমেন। সংকেত। সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ। নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৩, কলিকাতা, পৃ. ১৭৮।
১১. তদেব, পৃ. ১৭৯।
১২. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৬, কলকাতা, পৃ. ১৯৫।
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। যেতে নাহি দিব, (সোনার তরী) । বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৯৩, কলিকাতা, পৃ. ৪১।
১৪. চন্দ, সোমেন। সংকেত। সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ। নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৩, কলিকাতা, পৃ. ১৮৬।
১৫. ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু। কথাসাহিত্য: কথাসাহিত্যিক। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৬, কলকাতা, পৃ. ৯৪।
১৬. চন্দ, সোমেন। সংকেত। সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ। নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৩, কলিকাতা, পৃ. ১৯১।
১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ৭০ নং কবিতা, (নৈবেদ্য)। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ১৩৯৩, কলিকাতা, পৃ. ২৯৯।
১৮. চক্রবর্তী, অলক। বিশ শতক: কথাসাহিত্যে সময়বীক্ষা। উচ্চতর বিদ্যাচর্চাকেন্দ্র, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮, বর্ধমান, পৃ. ১০০-১০১।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. চন্দ, সোমেন। (সোমেন চন্দ তাঁর রচনাসংগ্রহ) । মজুমদার, দিলীপ, সম্পাদনা। নবজাতক প্রকাশন। কলকাতা। সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। পথের পাঁচালী। কামিনী প্রকাশালয়, ২০১১, কলকাতা।
৩. শ, রামেশ্বর। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ। পুস্তক বিপণি, ২০০৬, কলকাতা।
৪. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৬, কলকাতা।
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। যেতে নাহি দিব, (সোনার তরী) । বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৯৩, কলকাতা।
৬. ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু। কথাসাহিত্য: কথাসাহিত্যিক।বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৬, কলকাতা।
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ৭০ নং কবিতা, (নৈবেদ্য)। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ১৩৯৩, কলকাতা।
৮. চক্রবর্তী, অলক। বিশ শতক: কথাসাহিত্যে সময়বীক্ষা। উচ্চতর বিদ্যাচর্চাকেন্দ্র, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮, বর্ধমান।